International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-I, July 2016, Page No. 48-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

যুগ অভিঘাতে দুই কবি ও কাব্যঃ চণ্ডীমঙ্গল (মুকুন্দরাম) ও অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)

দীপঙ্কর আরশ
বি.সি কলেজ, আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

*One of the significant poetic traditions of the Middle Age is that of '**Mangalkabya**' , whose primary narrative engagement in worshipping the divine grace of different Gods and Goddesses. People of that period profoundly believe that the act of singing, writing, reading or even listening of this 'Kabya' would bring favour to mankind. Structurally, this kind of utterance maintained a specific 'Form'. But the fact that besides these conventional themes, Mangalkabya contains more important matter in its core -- the traces of the conventional period either explicitly or implicitly. Certainly, '**Chandimangal**' of Mukundaram and '**Annadamangal**' of 'Bharatchandra' are the foremost works in this regard.*

During the great upheavals, Mukundaram and Brahatchandra wrote their masterpieces in 16^{th} and 18^{th} centuries respectively. At the time of national disasters in two different centuries, both of the poets faced the endless crisis and even lost their shelters.

In this article we study and enlighten the impact of contemporary popular unrest time on the lives of these two poets and the relevant epoch-blow in their poetic creation.

Key Words: Vagya-birambana, Rastrabiporjoy, Yug-avighat, Peeron, Yug-yantrana, Bargee-hungama.

(১)

মধ্যযুগের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট ধারা ‘মঙ্গলকাব্য’। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। এই ব্যাপ্তিকালে খ্যাত, অখ্যাত বহু কবি বিভিন্ন মঙ্গল দেবীদের কেন্দ্র করে ‘মঙ্গলগান’ রচনা করেছেন। যে সকল দেবদেবীকে কেন্দ্র করে মঙ্গলগান রচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন - মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর ও অন্নদা। এছাড়া কালিকা, শীতলা, ষষ্ঠী, সারদা, দক্ষিণ রায়, সূর্য, গঙ্গা প্রভৃতি দেবদেবীকে কেন্দ্র করেও মঙ্গল গান রচিত হয়েছে মধ্যযুগে। এই সকল মঙ্গলকাব্যগুলির বিষয় নির্দিষ্ট হয়েছে মূলত পূজা প্রচারের কাহিনীতে। সংস্কার গত দিক থেকে বললে-তৎকালীন ধর্মপ্রাণ মানুষের সংস্কার ছিল, এই মঙ্গলকাব্যের পালাগান গাইলে, শুনলে, লিখলে বা পড়লে মঙ্গল হয়। গঠনগত দিক বিচারে প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের একটি নির্দিষ্ট ‘Form’ লক্ষণীয়। চিরাচরিত এই সকল বিষয়ের বাইরে কোন কোন মঙ্গলকাব্যের গভীরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যক্ষগোচর হয়। দেখা যায় বেশ কিছু কবির মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সমকালীন বিক্ষুব্ধ যুগ কম-বেশী স্থান পেয়েছে প্রকটতায় বা প্রছন্নতায়। অবশ্যই কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ এ দিক থেকে অগ্রগণ্য।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার বিখ্যাত দুই কবি। উভয় কবির জীবনই ভাগ্য বিড়ম্বনায় প্রায় একইভাবে কবলিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর এক স্থানীয় রাষ্ট্রবিপর্যয়ে গৃহহারা হয়েছিলেন মুকুন্দরাম, অনুরূপভাবে ভারতচন্দ্রকেও ভিটে ছাড়া হতে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থানীয় এক রাষ্ট্রবিপর্যয়ে। একদিকে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় ও সামাজিক দীনতা, অন্যদিকে নিজস্ব ভাগ্যবিড়ম্বনা – উভয়কে সঙ্গী করেই কাব্যরচনায় ব্রতীগ্রহণ দুই কবির। দেখা যায় তাঁদের কাব্য 'চণ্ডীমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল' এ সমকাল রূপলাভ করেছে বিভিন্ন সূত্রের আশ্রয়ে মঙ্গলকাব্যের কাহিনী কাঠামোকে বজায় রেখেই। উভয় কবিই সমকালীন জীবন ও জগৎকে দুচোখ মেলে দেখেছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে, তার অভ্যন্তরস্থ জীবনবোধ ও কর্মপ্রেরণাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং অনন্যসুলভ সৃজনী প্রতিভার সাহায্যে কাব্যের মধ্যে রূপায়িত করেছেন।

(২)

দামুন্যা গ্রামে রক্ষিত মুকুন্দরামের প্রাচীন পুঁথির প্রথমে ও শেষে কবির আত্মপরিচয় আছে। সেই পরিচয় থেকে জানা যায় কবির কয়েক পুরুষের বাস বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে রত্না নদীর তীরে। জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। পুরুষানুক্রমে তাঁরা দামুন্যার তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর জমি ভোগ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অধর্মী রাজার অত্যাচারে ও প্রধান রাজকর্মচারী বা ডিহিদার মাহমুদ সরীফের অত্যাচারে রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কট দেখা দিল। আর্থিক অবস্থার সাংঘাতিক অবনতি ঘটল। দেশের লোকের দুর্গতির সীমা থাকল না। বিশৃঙ্খলতার সুযোগে রাজকর্মচারী ও পোতদারদের সুদিন আসল ঠিকই, কিন্তু মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্তরাও ত্রাহি ত্রাহি রব করতে লাগল। তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর তালুক বাজেয়াপ্ত হল, তিনি বন্দী হলেন। পূর্ববর্তী রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল, নতুন রাজস্ব নিয়মে তা বন্ধ হল। এছাড়া অত্যাচারী রাজকর্মচারীরা মাপের কারসাজি করে পনেরো কাঠাকে এক বিঘা ধরে সেই হারে খাজনা ধার্য করল। 'খিলভূমি' অর্থাৎ অনাবাদী জমিকেও সুফলা ধরে নিয়ে খাজনা বাড়িয়ে দিল। নিরুপায় মানুষ যেটুকু সম্বল ছিল তা বিক্রি করে রাজার ক্ষুধা মেটাতে চেয়েছিল কারাবাসের ভয়ে। কিন্তু রাজপীড়নের সুযোগ নিয়ে অর্থলগ্নীকারী পোদ্দারের দল স্বল্প মূল্যে সেগুলি গ্রাস করতে চাইল। এছাড়াও বেশ কিছু বিপন্নতার সম্মুখীন হয়েছিল সাধারণ মানুষ। মুকুন্দও তারই মধ্যে একজন। শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করার সংকল্প নিলেন। অত্যাচার অনাচারের নিশ্ছিদ্র কালরাত্রির মধ্যে এক আঁধার রাতে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে রওনা দিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মেদনীপুরের দিকে। পথের দুঃখ যন্ত্রণাও ভয়ানক। যেটুকু সম্বল ছিল ডাকাত রূপরায় ছিনিয়ে নিল। পথের ক্লান্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিধ্বস্ত কবি ও তাঁর পরিবার বহু গ্রাম নদ-নদী অতিক্রম করে আশ্রয় নিল গুচুড়ে বা গোচাড়িয়া গ্রামের এক পুকুর পাড়ে। সেই পুকুরপাড়েই ঘুমন্ত অবস্থায় কবি স্বপ্নে চণ্ডীর মহিমাজ্ঞাপক কাব্য লেখার নির্দেশ লাভ করেছিলেন। এরপর বানভাসি কবি ও তাঁর পরিবার আশ্রয় পেলেন মেদনীপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের জমিদারীতে। বাঁকুড়া রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করলেন, দুর্ভাগ্যের মেঘ দূর হল।

বলা বাহুল্য, বন্দনাংশ বাদ দিলে 'গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণে'র মধ্যে নিজের জীবনের দুঃখ কাহিনীর এইসব বর্ণনা দিয়েই মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যরচনা শুরু করেছেন। সমালোচক মুকুন্দরাম সম্বন্ধে জানিয়েছেন, "তাঁহার সাতপুরুষের ভিটা ত্যাগ করিয়া যাইবার দুঃখ কাহিনী লইয়া এই কাব্যরচনা আরম্ভ। ব্যক্তিজীবনের এই সুকঠিন দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াও তাঁহার অনুভূতিশীল কবিহৃদয় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ব্যাপিয়া সেই দুঃখ স্মৃতির যে রোমন্থন করিয়াছে, তাঁহার সমগ্র কাব্য তাহার প্রমাণ। পশুকুলের দুঃখ নিবেদনের মধ্যে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে নিজের অবস্থার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ফুল্লরার দুঃখজীবনের মধ্যে তাঁহার নিজের অভাবগ্রস্ত জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে; এমনকি, সমৃদ্ধ সদাগরের পরিবারেও খুল্লনার যে দুঃখ আকস্মিক বিপৎপাতের মত একদিন উদয় হইয়া পরিণামে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাতে করুণ হইয়া উঠিয়াছে।।"[১]

সমকালীন যুগের অভিঘাত প্রশ্নে বিষয়টি আর একটু বিশদ করা যেতে পারে। প্রথমেই রাজা কালকেতু চরিত্রে কাল্পনিক মহত্ব আরোপের প্রসঙ্গে আসা যাক। মধ্যযুগের মানুষ ছিল রাজ অত্যাচারে অত্যাচারিত। রাজার বিরুদ্ধাচারণ বা প্রতিবাদ প্রতিরোধ তাদের কাছে ছিল কল্পনারও অতীত। সব অঘটনের মূলে আত্মকৃত পাপকে গণ্য করে অশ্রুপাত ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না। "এই নিশ্চেষ্ট ক্লীবত্বের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল অলস কল্পনার মায়াবরণ সৃষ্টিতে। প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই, তাই কল্পনায় রাজার দেবচিন্তাই ছিল একমাত্র প্রতিবিধান। রাজা কালকেতুর চরিত্রে সেই কাল্পনিক মহত্ত্ব আরোপে সেযুগের জনচিত্তেরই সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ ঘটেছে।"[২]

কালকেতু জঙ্গল কেটে বড় গ্রামের পত্তন করেছিল। জমিদারী পত্তনের কারণে তাকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বিভিন্ন জাতির মানুষ ও কৃষকদের আহ্বান করতে হয়। সেই প্রসঙ্গে বুলান মণ্ডলের সাথে কালকেতুর কথোপকথনে জানা যায় সেই সুযোগ-সুবিধা কী ধরণের। আর তার মধ্যেই ধরা পড়ে জমিদারী অত্যাচার-প্রজাপীড়ন। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে জানিয়েছে –

"আমার নগরে বৈস/যত ইচ্ছা চাষ চষ/তিন সন বহি দিহ কর।
হাল প্রতি দিবে তঙ্কা/কারে না করিহ শঙ্কা/পাট্টায় নিশান মোর ধর।।
নাহিক বাউড়ি দেরি/রয়্যা বস্যা দিবে কড়ি/ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ি/নানা বাবে যত কড়ি/নাহি নিব গুজরাট বাসে।।
পার্ব্বণী পঞ্চক যত/গুড়া লোণ সানা ভাত/ধানকাটি কলম-কসুরে।
যত বেচ চালু ধান/তার নাহি নিব দান/অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে।।"[৩]

স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রজাপীড়ক জমিদাররা হাল পিছু একটাকার অনেক বেশী খাজনা নিতেন। ফসল না হলেও প্রজারা ঐ টাকা দিতে বাধ্য থাকত। খাবার ধান, বীজধান প্রভৃতি দাদন দিয়ে দেড় দুই গুণ আদায় করা হত। ডিহিদার সম্পর্কে কৃষক কবির নিজ অভিজ্ঞতা ছিল। জমি নেওয়ার সময় প্রজাদেরকে সেলামি দিতে হত, পাকা দখল নিতেও জমিদারকে কিছু দিতে হত। এছাড়া, বিভিন্ন পার্বণ, গুড়-নুন প্রভৃতি উপাদান, ফসল কাটা, দান বা বিক্রয় প্রভৃতিতেও প্রজারা কর দিতে বাধ্য থাকত। যদিও যুগ-যন্ত্রণা প্রকাশ কবিকঙ্কণের উদ্দেশ্য ছিল না, তবুও এভাবেই কাব্যের বিভিন্ন অংশেই যুগের ছায়াপাত রয়েছে অসচেতনভাবেই।

কালকেতুর পীড়নে প্রাণান্ত পশুদের অসহায় বিলাপ, প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন প্রভৃতির মধ্যেও সমকালীন রাষ্ট্রজীবনের বিপর্যস্ত প্রজা-সাধারণের দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটি অনেকের কাছে 'আজগুবি' মনে হলেও কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করলে বনের বাক্-হীন পশুরা যেন আলাদা মানব চরিত্র লাভ করে। তারা যেন ষোড়শ শতাব্দীর রাষ্ট্র বিপর্যয়ের লেলিহান শিখায় কবলিত উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যেমন- দিন-আনা, দিন-খাওয়া মানুষ যারা রাজ সরকারের সাথে সেভাবে যুক্ত নয় তারাও যুগের আঘাতে বিপন্ন। ভালুকের আবেদনে যেন সেকথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে-

"উইচারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।।"[৪]

একই রকমভাবে বরাহের ক্রন্দনের অন্তরালে যেন খুঁজে পাওয়া যায় সেকালের ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের সকরুণ আর্তনাদ-

"শাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।।
ছিল মাত্র অভাগির কোলে এক পো।
পাশরিতে নারিগো তাহার মায়া মো।।"[৫]

হস্তিনীর বিলাপে পশুজীবনের চিত্রের আধারে ধরা পড়ে সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয়-

"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর।।
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত হৈল আপনার বৈরী।।"[৬]

সমাজে প্রতিপত্তিসম্পন্ন ভূস্বামী হলেও যে মুক্তি নেই, রাজরোষে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে পারে তার উদাহরণ গোপিনাথ নন্দী। রাজরোষে পতিত হয়ে গোপীনাথকে বন্দী হতে হয়। সেই বন্দী দশায় নিশ্চয় পশুরাজ সিংহের মতোই তাঁর প্রার্থনা হওয়া উচিত-

"ভালে টীকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।।"[৭]

'গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ' অংশে কবির ব্যক্তিগত জীবন পরিচয় বা পশুদের দুঃখ যন্ত্রণা প্রকাশের মধ্যেই কেবল যুগ-যন্ত্রণার ছায়াপাত নেই। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের বহু অংশেই সেই ছায়া পড়েছে। যেমন- দেবখণ্ডে হরগৌরীর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন, অভয়ার কাছে ফুল্লরার বারমাস্যা কথন ইত্যাদি অংশে তা সহজলভ্য। তবে, মুকুন্দরামের কাব্যে যুগ-যন্ত্রণার কথা বা দুঃখ ভোগের কথা থাকলেও দুঃখবাদ বা নৈরাশ্যবাদ হতে তাঁর কাব্য মুক্ত। বলা যায়, দুঃখের মধ্যে বা শেষে আশ্বাসবানী ধ্বনিত হয়েছে। এর একটি বড় কারণ তাঁর কবিমানস। এ প্রসঙ্গে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য – "ঝটিকাতাড়িত বালুকণা যেমন বিলয়ের আশঙ্কার অপেক্ষা বায়ুসঞ্চরণের অভিনব অভিজ্ঞতার কৌতুকাবহ দিকটি বেশী অনুভব করে, তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রলয়ঝটিকায় উন্মুলিত ও উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত এই কবিসত্তা নিজ ক্ষতি ও সর্বনাশের দিকটা লঘু করিয়া, দেবীর প্রত্যাদেশে তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণজনিত আনন্দ, নূতন স্থানে আশ্রয়প্রাপ্তির নিশ্চিন্ত আরাম ও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসকেই মুখ্যভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।"[৮]

(৩)

কবিকঙ্কণের আবির্ভাবের প্রায় দেড়'শ দু'শ বছর পর ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যরচনা। কবিকঙ্কণের মতো তাঁর জীবনও ছিল বিক্ষুব্ধ, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ঠাসা। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষী – আধুনিক কালের গল্প উপন্যাসেও তাহা স্বচ্ছন্দে স্থান পাইতে পারে।"[৯] যাইহোক, সেই 'বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষী' বিবরণ কিন্তু কবিপ্রদত্ত পরিচয় হতে বিশেষ মেলে না। গ্রন্থ-মধ্যে কবি নিজের সম্বন্ধে খুব সামান্যই পরিচয় দিয়েছেন। তবে, কবি ঈশ্বরগুপ্তের একনিষ্ঠ চেষ্টায় ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনীর বহু তথ্য আমরা নাগালে পেয়েছি। ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত নিরলস ভাবে ভারতচন্দ্রের জীবনের উপর গবেষণা করেছেন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। দেবানন্দপুর, মূলাজোড়, কৃষ্ণনগর, গুস্তে প্রভৃতি গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি। সেই সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো গ্রামে জমিদার বংশে কবির জন্ম। ভারতচন্দ্রের পিতা সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। কিন্তু বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের মায়ের (বিষ্ণুকুমারী) সঙ্গে বিবাদে তাঁকে জমিদারী হারাতে হয়। পিতা সর্বস্বান্ত হওয়ায় বাধ্য হয়ে বাল্য-কবি মাতুলালয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন। মাত্র চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সেই তিনি সংস্কৃতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে ফারসি ভাষাও তাঁকে আয়ত্ব করতে হয়। তাঁর এমনই দুর্ভাগ্য যে অগ্রজের পরামর্শ মতো পিতৃসম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বর্ধমানরাজের কাছে গেলে বিনা দোষে কারারুদ্ধ হন। ভারতচন্দ্র তাঁর সুমধুর ব্যবহারে কারাধ্যক্ষকে বশীভূত করে রঘুনাথ নামক নাপিত ভৃত্যকে নিয়ে হাজির হন কটকে। কটকের সুবাদার শিবভট্ট তাঁদেরকে পুরীয় মঠে থাকার সুযোগ করে দেন। সেখানে কবি বৈষ্ণব বেশ ধারণ করেন এবং

সকলের কাছে 'মুনি গোঁসাই' নামে পরিচিত হন। ঘটনাচক্রে মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রাকালে রঘুনাথের গোপন সংবাদে ভারতচন্দ্রকে তাঁর শালীপতি ভাই জোর করে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং গৃহবাসী করেন। তবে, নিজ গ্রামে কবি আর ফিরে যেতে চাননি, শ্বশুরালয়ে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। ভাগ্য অন্বেষণে শেষ পর্যন্ত কবির ঠাঁই মেলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সভাকবি রূপে। সেই রাজারই নির্দেশে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য, যার মধ্যে সমকালীন যুগের অভিঘাতের চিত্র স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

এক অবক্ষয়ী যুগে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব, যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে চলছিল নানা পালাবদল। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে জাহাঙ্গীর ও শাহাজাহানের শাসনকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার কোন নতুন দুর্যোগ দেখা না দিলেও দ্বিতীয়ার্ধে ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বাংলাদেশ, অর্থনৈতিক শোষণে জীর্ণ হয়ে পড়ল। এই সময় প্রত্যেক সুবাদারই সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করে কোটি কোটি টাকা সম্রাটকে পাঠাতেন এবং নিজেদেরও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করতেন। এই সুবাদাররা ছিলেন মূলত অসৎ, অর্থলোলুপ, বিলাসী এবং কামুক। তাঁদের চারিত্রিক প্রভাবে অমাত্যবর্গও ছিল প্রভাবিত। বলা বাহুল্য, হিন্দু-মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় এবং জমিদারবর্গ ঐ ধরণের জীবনাদর্শের অনুসরণে জীবনকে সার্থক করতে চাইছিল। "একটা দূষিত, পৌরুষহীন লালসা-শৈথিল্য সারাদেশে প্রকট হয়ে উঠল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।"[১০]

মুঘল সম্রাট, সুবাদার প্রভৃতিদের অর্থলোলুপতায় করভারে গোটা দেশ হয়েছিল পীড়িত। তার উপর মাঝে-মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মগ-পর্তুগীজদের হানাদারি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল সাধারণ মানুষের উপর। অষ্টাদশ শতকেও একই রকম অবস্থা চলতে থাকে। সুশাসক মুর্শিদকুলি বা আলিবর্দীও ঐ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেননি। এমনকি তাঁদের করের বোঝায় সাধারণ মানুষের প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত। এর ওপর বর্গী হাঙ্গামার দামামা। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের 'গ্রন্থ সূচনা' অংশে রাজনৈতিক পালাবদলের পাশাপাশি এই বর্গীহাঙ্গামারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন -

"বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী।।.....
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।।"[১১]

বলা বাহুল্য, বর্গী হাঙ্গামায় শস্যক্ষেত্র ও জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বর্গীহাঙ্গামার মোকাবিলায় নবাব আলিবর্দী প্রজাদের থেকে নির্মমভাবে কর আদায় করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ক্ষেত্রগুপ্ত 'ভারতচন্দ্র রচনা সমগ্র'তে জানিয়েছেন, "...সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় সমাপ্তিকাল পর্যন্ত বাঙালির জীবন বিবিধ অব্যবস্থা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক দৈন্য ও নিষ্ঠুর শোষণ, বোম্বেটে বর্গীর হানাদারি ও দুর্ভিক্ষ। রুচিহীনতা ও মোগলাই বিলাসকলা অভিজাতবর্গের জীবন থেকে ক্ষরিত হয়ে গোটা সমাজকে বিষিয়ে দিচ্ছিল।...চৈতন্যপন্থী আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রাণশক্তি এখন নিঃশেষিত। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের স্থলে এসেছে সংশয়। পুরাতন ধর্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলি অর্থহীন হয়ে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে পড়েছিল। সর্বব্যাপী অবক্ষয় মধ্যযুগের অবসান সূচিত করেছিল।"[১২]

সেই 'সর্বব্যাপী অবক্ষয়ে'র কালেই ছলাকলাময় হাস্যপরিহাস, বিকৃত রুচির কৌতুক ও ভাঁড়ামি, নৃত্যগীতাদি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রাজসভাকবিরূপে তাঁর আসন গ্রহণ। ঐ রুচির রাজার এবং পারিষদবর্গের

মনোরঞ্জনই তাঁর একমাত্র কাজ। যদিও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনে কূটনীতি ও ধর্মনীতি একসূত্রে গাঁথা ছিল এবং তিনি প্রয়োজনে একাধিকবার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে ধর্ম ও পূজাপোসনা করেছিলেন তবুও সভাকবির কাছ থেকে পার্থিব জীবনরঙ্গের কাব্য আস্বাদনেই অধিক উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথা এবং পারিষদবর্গের ঐ একই ধরণের রুচির কথা মাথায় রেখেই কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে আদিরসের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' এর প্রাবল্য অধিক, প্রথম খণ্ড 'অন্নদামঙ্গল' -ও এই রুচিবোধের পরিণামকে ব্যক্ত করে। সেখানে পৌরাণিক দেবদেবীদেরকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে আদিরসের স্ফুরণ। কামোন্মত্ত শিবের অপ্সরাদের পিছনে ধাওয়া করে ফেরা, বিবাহসভায় তাঁর উলঙ্গ হওয়া, কামোন্মত্ততার কারণে দেব-দেবীদের অভিশপ্ত হওয়া ইত্যাদি অংশ তাঁর প্রমাণ। সম্মোহণ, উন্মদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন - পঞ্চবাণের অধিকারী মদনদেব সম্মোহণ বাণ দ্বারা শিবের ধ্যানভঙ্গ করেন। মুকুন্দরাম এর ফল বর্ণনায় 'ঈষৎ চঞ্চল শিব হইলা অন্তরে' বলে কাজ সেরেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র সে যুগের নিম্নরুচির মানুষের মনোরঞ্জন করতে শিবের কামোন্মত্ততার পূর্ণতর চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই শিব কামনা নিবৃত্তিতে নারী অন্বেষণকারী, যাঁর ভয়ে ত্রস্ত হয়ে অপ্সরা, দেবী প্রভৃতিরা পলায়ন করতে বাধ্য হন। শিবের উলঙ্গ হওয়ার চিত্রেও যুগরুচি অভিমুখী বর্ণনা প্রদান করেছেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবদেবীরা অভিশপ্ত হন অতিরিক্ত কাম-লালসার বশবর্তী হয়ে। কাব্যে সেই বর্ণনা দীর্ঘায়িত হয়েছে। এইসব অংশ হতে রসগ্রহণে কেবলমাত্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পারিষদবর্গের চরিত্রবৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, স্পষ্ট হয়েছে সমসাময়িক যুগের বিশেষ একটি শ্রেণির মানস বৈশিষ্ট্য।

একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-ব্যভিচারের প্রাবল্য আর অন্যদিকে অন্নহারাদের 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' রব এই ছিল তৎকালীন যুগের সামাজিক স্থূল শ্রেণি পরিচয়। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ডে সেই অন্নের হাহাকারের চিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে। "যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।/হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান।।"[১৩] বা, "কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।"[১৪] এই চিত্র বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত কৃষি-অর্থনীতির শিকার দরিদ্র-সাধারণ খেতে না পাওয়া মানুষের। একই বিড়ম্বনার চিত্র ভিক্ষা না পাওয়া ব্যাসদেবের আখ্যানেও।

অভাব ও দারিদ্র্যের মর্মান্তিক চিত্র মেলে হরিহোড়ের কাহিনীতে, যা অষ্টাদশ শতাব্দীর খেতে না পাওয়া নিম্নবিত্ত জীর্ণ মানুষের জীবনযাপনকে চিনিয়ে দেয়। 'কাঠ ঘুঁটে' সংগ্রহ করে বিক্রির মাধ্যমে অতি কষ্টে পিতামাতাসহ হরিহোড় জীবিকা নির্বাহ করে। 'কাঠ ঘুঁটে' জোগাড় করতে পারা না পারার মধ্যে সমগ্র পরিবারটির ভাগ্য নির্ধারিত। যথাযোগ্য অন্ন-বাসস্থানের সংস্থানে ব্যর্থ হরিহোড়ের পক্ষে তাই ছদ্মবেশিনী দেবীকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। হরিহোড় বাধ্য হয়ে জানিয়েছে তার অসহায় দারিদ্র-যাপনের কথা -

> "এই দেখ বৃদ্ধ বাপ/অন্ন বিনা পান তাপ/বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
> গেল চারিপর দিন/অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ/যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে।।"[১৫]

কবি পদ্মিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনেকটাই অতিশায়িত। কিন্তু তার পরেও বলতে হয় অষ্টাদশ শতকের প্রেক্ষিতে সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। "লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।/ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন।।"[১৬] এই বর্ণনা আতিশয্য মনে হলেও বস্ত্র সংকট বাস্তব। আর 'তৈল বিনা চুলে জটা' বা 'অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্ম সার' সম্পূর্ণ যুগোপযোগী।

এরকম এক বিপন্ন সময়ে ধর্মীয় জীবনও যে কক্ষচ্যুত হবে এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়াবে এটিই স্বাভাবিক। ঘটেও ছিল তাই। সেই সময় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছিল। কাব্যে ব্যাস-উপাখ্যানের মধ্যে সেকালের ধর্মাচরণে যে অস্থিরতা তার চিত্র পাওয়া যায়। নিজের ভাগ্য অন্বেষণে ব্যাসদেব ক্ষণে ক্ষণে উপাস্য দেবতার বদল ঘটিয়েছেন, ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন; আবার স্বার্থে আঘাত লাগলে বিরোধিতা করেছেন। "হরিহর দুই মোরা অভেদশরীর।/অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর।।"[১৭] মহাদেবের এই

ধর্মসমন্বয়ের বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করার মতো উপাসক তিনি ছিলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ। সেই প্রতিহিংসা থেকেই তাঁর দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের উদ্যোগ –

> "করিয়াছি যত তপ/করিয়াছি যত জপ/সকলি করিনু ইথে পণ।
> নিজ নাম জাগাইব/এইখানে প্রকাশিব/কাশীর যে কিছু আয়োজন।।"[১৮]

ব্যাসকে কেন্দ্র করে ভারতচন্দ্র যে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির চিত্র তুলে ধরেছেন সমকালীন উপপ্লবের কালে তা একেবারে বাস্তব। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তঃসারশূন্য যুগ-অভিঘাতে এরকমই অবস্থা তৈরী হয়েছিল। তাই স্বর্গের দেবদেবীরা মর্ত্যে আসতে নারাজ – "ভূমে কলি বড় বলবান্ / নাহি রাখে ধর্মের বিধান।।"[১]

(৪)

লক্ষণীয়, একই রকম ভাগ্যবিড়ম্বনায় এবং প্রায় একই প্রকার রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্য দুটিতে যুগ অভিঘাতের প্রকাশ ঘটেছে ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন দিকে। বিশুদ্ধ হিউমারের সাহায্যে মুকুন্দরাম সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, অত্যাচার-সুবিচার ইত্যাদিতে তরঙ্গিত জীবনরঙ্গের যে উপভোগ্য পূর্ণতর ছবি এঁকেছেন, ভারতচন্দ্রে সেই পূর্ণতা মিলবে না। আবার, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বিধা ও অন্তর্বিরোধের সত্যটিকে ভারতচন্দ্র পাণ্ডিত্যের অমোঘতায় ও ব্যঙ্গ-রসিকতায় যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য, মুকুন্দরামের কাব্যে তা মেলে না। আসলে, সাধারণ গ্রামীণ ভদ্রলোকের মতো জীবনযাপন তিনি করেননি এবং জীবনের একটা বড় অংশ অভিজাত ভূস্বামীদের সঙ্গে কাটিয়েছেন বলেই যুগক্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন প্রখর মনীষাসম্পন্ন কবির পক্ষে একাজ সহজ হয়েছিল। তবে, বাস্তবতার প্রশ্নে বেশিরভাগ সমালোচক বা আমরা অনেকেই মুকুন্দরামকে শ্রেষ্ঠ আসনটি দান করি। কিন্তু, "ভারতচন্দ্রের কাব্য সমাজমানব অপেক্ষা সমাজমানসেরই অধিক প্রকাশ। মুকুন্দরামের কাব্যের বাস্তবতা বেশি, বলা হয়। বাস্তবচিত্রের ব্যাপারে কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বাস্তবের যে ভাবরূপ তার আত্মাকে– আত্মার উদ্ভাসে গভীরতর বাস্তবকে উদঘাটিত করে, মুকুন্দরামে তার রূপ কি যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে? ঐ সত্যতর বাস্তবের কবিরূপে ভারতচন্দ্রকে দাঁড় করাতে চাই না, কিন্তু, অন্তত আংশিকভাবেও তিনি কি যুগভাবনাকে অধিক প্রকাশ করেননি ?"[২০]

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য শ্রী আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি.; প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০০,পৃ. ৫০৮।
২. সরকার শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল; মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি.; প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৫; পৃ. ২৩।
৩. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার ও চৌধুরী শ্রী বিশ্বপতি, কবিকঙ্কণ-চন্ডী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; পুনর্মুদ্রিত, oct 1966; পৃ. ৩৩৫।
৪. ঐ, পৃ. ২০২।
৫. ঐ, পৃ. ২০৩।
৬. ঐ, পৃ. ২০৩।
৭. ঐ, পৃ. ২০১।
৮. ঐ, পৃ. ২৯।

৯. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/তৃতীয় খণ্ড; মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি.; প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬; পৃ. ৯৪৮।
১০. গুপ্ত ড. ক্ষেত্র ও দে ড. বিষ্ণু, ভারতচন্দ্র রচনা সমগ্র; ভৌমিক এন্ড সন্স; ২০শে জুন ১৯৭৪; পৃ. বার।
১১. ঐ, পৃ. ১৪।
১২. ঐ, পৃ. বার।
১৩. ঐ. পৃ. ৭৭।
১৪. ঐ, পৃ। ৭৮।
১৫. ঐ, পৃ. ১৬১।
১৬. ঐ, পৃ. ১৫৭।
১৭. ঐ, পৃ. ১২৬।
১৮. ঐ, পৃ. ১২৯।
১৯. ঐ, পৃ. ১৭২।
২০. বসু শঙ্করীপ্রসাদ, কবি ভারতচন্দ্র; দে'জ পাবলিশিং; প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০০; পৃ. ১০।

গ্রন্থঋণ:

১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা. লি.; মাঘ ১৪০০, প্রথম প্রকাশ।
২। শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় খন্ডঃ চৈতন্যযুগ; মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি.; ১৯৬৬, দ্বিতীয় সংস্করণ।
৩. শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত/তৃতীয় খণ্ড; মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি.; ১৯৬৬, প্রথম সংস্করণ।
৪. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; oct 1966, পুনর্মুদ্রিত।
৫. ড. ক্ষুদিরাম দাস, কবিকঙ্কণ-চন্ডী; দে'জ পাবলিশিং; ফাল্গুন ১৪১৭, তৃতীয় সংস্করণ।
৬. শ্রী সৌমেন্দ্রনাথ সরকার, কবিকঙ্কণ মকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল; মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রা. লি.; ১৯৭৫, প্রথম সংস্করণ।
৭. সনৎকুমার নস্কর, মুকুন্দ চক্রবর্তী- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী; রত্নাবলী; মাঘ ১৪০০,প্রথম প্রকাশ।
৮. ড. ক্ষেত্রগুপ্ত ও বিষ্ণু দে, ভারতচন্দ্রের রচনা সমগ্র; ভৌমিক এন্ড সন্স; ২০শে জুন ১৯৭৪।
৯. শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল; মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি.; আগস্ট ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ।
১০. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র; দে'জ পাবলিশিং; জানুয়ারী ২০০০, প্রথম দে'জ সংস্করণ।